কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন



প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?



প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অফ সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

কুরআন গবেষণা ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮ মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

১ম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০২
২য় সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৬
৩য় মুদ্রণ: জুন ২০০৭
৪র্থ মুদ্রণ : নভেম্বর-০৮

কম্পিউটার কম্পোজ

আম্মারস কম্পিউটার
ফোন : ০১৯১৭০১৭৮৯২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ঃ ২৪.০০ টাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ :	৭
	❖ আল-কুরআন	৭
	❖ আল-হাদীস	৮
	❖ বিবেক-বুদ্ধি	৯
৩.	গোড়ার কথা	১৬
৪.	ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্বের ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির তথ্য	১৬
৫.	কুরআন অনুযায়ী কুরআনে বিজ্ঞানের তথ্য আছে কিনা	১৬
৬.	আল-কুরআনে বিজ্ঞানের তথ্য যেভাবে এসেছে	১৮
৭.	বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে আল-কুরআনের তথ্য	১৯
৮.	ইসলামে বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার কারণ	২২
৯.	আল-কুরআনে উল্লেখ থাকা বিজ্ঞানের কিছু বিষয়	৩৫
১০.	ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ থাকার কারণ	৪৩
১১.	বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের বিজ্ঞানে চরম অধঃপতনের কারণ	৪৩
১২.	মুসলমানদের পৃথিবীতে আবার বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে প্রথম স্তরে যা করতে হবে	৪৪
১৩.	মুসলমানদের আবার বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে দ্বিতীয় স্তরে যা করতে হবে	৪৫
১৪.	শেষ কথা	৪৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলমান ও অমুসলমানদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।
এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ : 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বলছেন, আমি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছি, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় (অর্থাৎ সামান্য অর্থ, সুযোগ-সুবিধা বা খ্যাতি ইত্যাদি পায়), তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।
তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।
লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ .

অর্থ : এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে।

তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারীর অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলমানদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশীয়াহ:২২,নিসা:৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে (কারণ, কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা হলো হাদীস) কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিহাহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১৪.১.২০০৪ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০টায় বিয়াম মিলনায়তন (মাল্টিপারপাস হল) ৬৩ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (সা.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের মূল উৎস তিনটি– আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি মূল উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটি যথাযথ ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (সা.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রকার স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করা এবং তারপর চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক একটা আয়াতে

এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, তথা বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে বিপরীতধর্মী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. আল-হাদীস

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যেগুলো কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়। হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণনাকারী সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا.

অর্থ: শপথ মানুষের জীবনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা: ৮ নং আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষকে তিনি জন্মগতভাবে কোনটি পাপ কাজ ও কোনটি সৎ কাজ অর্থাৎ কোনটি ন্যায় ও কোনটি অন্যায়, ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে তা বুঝার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্মগত এই ক্ষমতাকেই বিবেক বলা হয়

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য হচ্ছে–

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلامُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.(اَحْمَدُوَالتِّرْمِذِىْ)

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো : হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন : যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। (আহমদ, রমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ.

অর্থ : যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা

কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকী)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে।

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমনই তাতে সময়ও লাগে খুব কম

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা মনের প্রশান্তি নিয়ে তার উপর আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ নয়।

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবেঃ

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

খ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক রকেটে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক রকেটে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে। আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না

তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারির শক্তি অথবা বন্দুক বা কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা যে সকল বিষয়ে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য অস্পষ্ট সে সকল বিষয়ে মূল উৎস তিনটির আলোকে অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস বলে। কিয়াসকারীকে কুরআন ও হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানে যেমন পারদর্শী হতে হয় তেমনি তার বিবেক-বুদ্ধিও প্রখর ও সমুন্নত থাকতে হয়।

আর কোন বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞের কিয়াসের ফলাফল যদি একই হয়, তবে ঐ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলা হয়। ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ঐ

সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে এর কয়েকটি উদাহরণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে। তাই সহজেই বুঝা যায়, কিয়াস ও ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের তথ্যের কোন মূল উৎস নয়।

এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে তাই এ ব্যাপারে কিয়াসের কোন সুযোগ নেই।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ক্রমধারাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.) ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ক্রমধারাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ক্রমধারাটি (Flow chart) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'কোন বিষয়ের সঠিকত্ব যাচাই এবং বক্তব্য উপস্থাপনের নীতিমালায় কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ইসলাম-সম্মত ক্রমধারা (বর্ণনা ও চিত্রগত)' নামক বইটিতে। তবে ক্রমধারার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

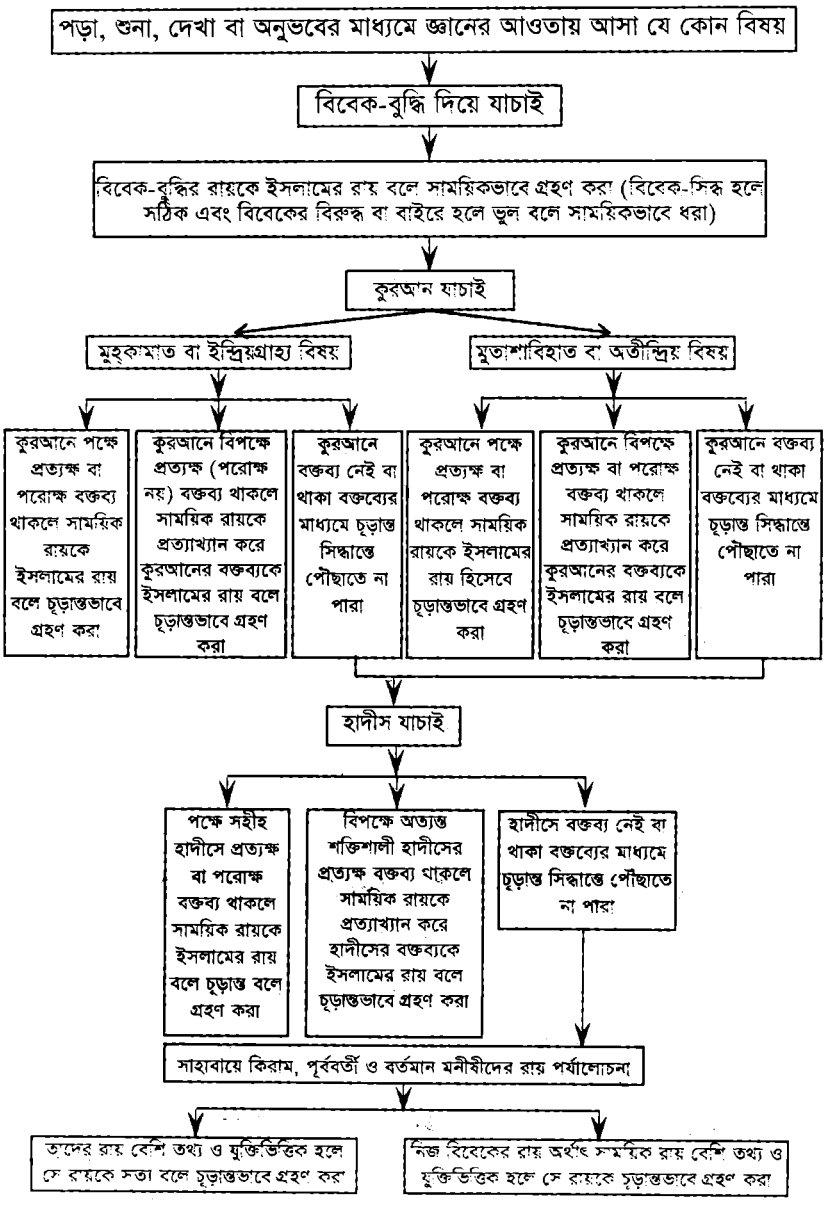

মূল বিষয়

গোড়ার কথা

মাত্র ৭-৮ শ' বছর আগেও মুসলমান জাতি বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও অনুসরণীয় ছিলো। অন্য জাতির লোকেরা বিজ্ঞান শিখতে মুসলমানদের কাছে আসতো আজ মুসলমানরা বিজ্ঞানের সব শাখায় পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি থেকে অনেক অনেক পিছনে। মুসলমানরা আজ বিজ্ঞান শিখতে ঐ সকল জাতির কাছে যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানে মুসলমান জাতির অতীত ও বর্তমান অবস্থানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সহজেই বুঝা যায়, মারাত্মক কোন ত্রুটি ছাড়া তা হয়নি। আর সে ত্রুটি ৪৯% অর্থাৎ অর্ধেকের কম মুসলমানের মধ্যে থাকলেও তা হত না। কী সেই ত্রুটি এবং তা থেকে উদ্ধার পেয়ে বিজ্ঞানে আবার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে মুসলমানদের কী করতে হবে, সে বিষয়ে আলোকপাত করাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্বের ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির তথ্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। অর্থাৎ জীবনের সকল দিকের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য আছে তথা জীবনের সকল দিক সম্বন্ধে ইসলামে তথ্য আছে। সভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে এটা অতি সহজেই বলা যায় যে, বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের জীবন অচল। মানুষের জীবনের যত দিক বাস্তবে কল্পনা করা যায় তার সকল দিকে বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ পদচারণা বর্তমানে প্রমাণিত। তাই সহজেই বলা যায়, ইসলামী জীবন বিধানে তথা কুরআন ও হাদীসে বিজ্ঞানকে অনেক গুরুত্ব দেয়া এবং সেখানে বিজ্ঞানের নানা ধরনের তথ্য থাকার কথা।

কুরআন অনুযায়ী কুরআনে বিজ্ঞানের তথ্য আছে কিনা

সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ .

অর্থ: আর তোমার ওপর যে কিতাব আমি (আল-কুরআন) নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে সকল বিষয়ের বর্ণনা।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন, তিনি আল-কুরআনে ইসলামের সকল বিষয় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইসলামে এমন অনেক বিষয় আছে যা কুরআনে নেই। তা এসেছে সুন্নাহ তথা হাদীস থেকে।

যেমন—নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আমলের বাস্তবায়ন পদ্ধতির অনেক ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নাহ ও মুস্তাহাব আরকান-আহকাম এবং ইসলামের অসংখ্য খুঁটি—নাটি বিষয়। তাহলে এ আয়াতে আল্লাহ যে বলেছেন, তিনি আল-কুরআনে ইসলামের সকল বিষয় বর্ণনা করেছেন এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা কী হবে? চিন্তার বিষয়, তাই না?

আয়াতে কারীমার প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইসলামের সকল বিষয়কে মৌলিকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় :

এ বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো, যার একটিও না পালন করলে মানুষের পুরো জীবন সরাসরি ব্যর্থ হবে।

২. দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় :

এ বিষয়গুলো হচ্ছে প্রথম স্তরের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। এ বিষয়গুলোর একটিও বাদ গেলে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হবে। আর এর ফলস্বরূপ আবার মানুষের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

৩. অমৌলিক বিষয় :

এ বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো যার সব ক'টিও বাদ গেলে মানুষের জীবন ব্যর্থ হবে না; তবে তা কিছুটা অসুন্দর হবে বা তাতে পরিপূর্ণতার কিছু অভাব থাকবে।

আলোচ্য আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ যে বলেছেন, আল-কুরআনে তিনি ইসলামের সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেখানে বুঝিয়েছেন— আল-কুরআনে তিনি ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় উল্লেখ করেছেন। আর ঐ বিষয়গুলো হচ্ছে আল-কুরআনের মূল বিষয়গুলো। আল-কুরআনের অন্য সকল বিষয় ঐ মূল বিষয়গুলো ঘিরে আবর্তিত হয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর কিছু উল্লেখ আছে কুরআনে আর সবগুলো আছে সুন্নাহে। আর অমৌলিক বিষয়গুলোর বেশির ভাগ আছে হাদীসে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো এবং কামেল হওয়ার ও বেহেশত পাওয়ার সর্বনিম্ন যোগ্যতা কী তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়' নামক পুস্তিকাটিতে

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সভ্যতার বর্তমান স্তরে বিজ্ঞান ব্যতীত মানুষের জীবন অচল। অর্থাৎ বর্তমানে বিজ্ঞান মানুষের জীবনের একটি মৌলিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি কুরআনে ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাই এ আয়াত থেকে বুঝা যায় আল-কুরআনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ আছে।

আল-কুরআনে বিজ্ঞানের তথ্য যেভাবে এসেছে

আল-কুরআন হচ্ছে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুশৃঙ্খল, শান্তিময় ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে পরকালে কৃতকার্য হওয়ার একখানা গাইড বুক (Mannual)। তাই আল-কুরআনে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা ইঙ্গিতে এমনভাবে এবং ততটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, যেন তার ওপর ভিত্তি করে রাসূল (সা.) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে তা বুঝিয়ে দিতে এবং সাধারণ মানুষ কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে তাদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝে নিতে পারে এবং তার প্রয়োগ এমনভাবে করতে পারে, যেন মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, শান্তিময় ও প্রগতিশীল করতে সেটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ কথাটিই আল-কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ : আর এই যিক্‌র (আল-কুরআন) তোমার (রাসূল সঃ) প্রতি নাযিল করেছি যেন, তোমার ওপর যা নাযিল করা হয়েছে, তা তুমি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে দাও (মানুষের নিকট পরিষ্কার করে তোল)। আর তারা (সাধারণ মানুষরা) নিজেরাও যেন তা নিয়ে (কুরআন-সুন্নাহর আলোকে) চিন্তা-গবেষণা করে (সেটার বিস্তারিত অবস্থা বের করার লক্ষ্যে)। (নাহল:৪৪)

ব্যাখ্যা : এই বিখ্যাত আয়াতে মহান আল্লাহ রাসূল (সা.) কে আল-কুরআনের বক্তব্য মানুষের নিকট কথা ও কাজ এবং সমর্থনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করতে বলেছেন এবং সাথে সাথে সাধারণ মানুষকেও তা নিয়ে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। যাতে তারা সেটাকে আরো উন্নত করতে পারে। এ আয়াতের ব্যাখ্যার সমর্থনকারী হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে পুস্তিকার তথ্য উৎসের বিবেক-বুদ্ধি বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ৯) তাই ইসলামের বিভিন্ন বিষয় জানা ও বুঝার জন্যে গুরুত্ব অনুযায়ী মাধ্যমগুলো হচ্ছে–

১. আল-কুরআন,
২. আল-হাদীস,
৩. বিবেক-বুদ্ধি,

এই তিনটির মধ্যে আল-কুরআন হচ্ছে নির্ভুল এবং স্বাধীন। হাদীস হচ্ছে কুরআনের অধীন। আর বিবেক-বুদ্ধি হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অধীন।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলোও তাই কুরআনে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে গবেষণা করে বিস্তারিত তথ্য বের করে নিয়ে তা মানুষের কল্যাণের জন্যে লাগাতে বলা হয়েছে।

বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে আল-কুরআনের তথ্য

তথ্য-১

আল-কুরআনের অনেক জায়গায় কুরআনকে বলা হয়েছে حَكِيْمٌ অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কিতাব। ইসলাম তথা মুসলমানদের জন্যে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম বলেই কুরআন নিজেকে বিজ্ঞানময় বিশেষণে ভূষিত করেছে।

তথ্য-২

আল-কুরআনের প্রায় ১/৮ অংশ হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা। বিজ্ঞানের অপরিসীম গুরুত্ব না থাকলে মহান আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবখানির প্রায় ১/৮ অংশ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা দিয়ে পরিপূর্ণ রাখতেন না।

তথ্য-৩

ক.

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

অর্থ : এটি (আল-কুরআন) একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার মাধ্যমে নাযিল করেছি, যাতে (মানুষ)-এর আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং উলিল আলবাবরা যেন তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। (ছোয়াদ:২৯)

ব্যাখ্যা : এ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ প্রথমে আল-কুরআনের আয়াত নিয়ে সকল যুগের সকল মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করতে সাধারণভাবে (Nonspecifically) বলেছেন। তারপর উলিল আলবাব নামের এক বিশেষ ধরনের বা বিভাগের মানুষকে নাম ধরে সম্বোধন করে অর্থাৎ বিশেষভাবে, তা থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন। এখান থেকে সহজেই বুঝা যায় উলুল-আলবাব

ধরনের মানুষকে আল্লাহ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন আর এই উলুল-আলবাবদের সম্বন্ধে কুরআনে অনেক তথ্য বা বক্তব্য আছে তার একটি হল–

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ.

অর্থ: আর (কুরআন থেকে) প্রকৃত শিক্ষা শুধু উলুল-আলবাবরা গ্রহণ করে (গ্রহণ করতে পারে)। (আল-ইমরান: ৭)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র উলুল-আলবাবগণ কুরআন থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যারা প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে তারা প্রকৃত আমল করতে পারবে এবং সঠিকভাবে অপরকে তা শিক্ষা দিতেও পারবে, এটি একটি সহজ বোধগম্য কথা। তাহলে এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র উলুল-আলবাবগণ কুরআন হতে প্রকৃত শিক্ষা নিতে পারবে। সে অনুযায়ী প্রকৃত আমল করতে পারবে এবং অপরকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারবে। তাই উলুল-আলবাব বলতে মহান আল্লাহ কাদের বুঝিয়েছেন তা সকল মুসলমানের ভালোভাবে জানা ও বুঝা দরকার। উলুল-আলবাব কারা হবে তা আল্লাহ জানিয়েছেন এভাবে–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ.

অর্থ : নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, 'উলিল আলবাবদের' জন্যে। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় এবং চিন্তা-গবেষণা করে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে। (আল-ইমরান:১৯০)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলছেন, মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে 'উলিল আলবাবদের' জন্যে। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে বলছেন, মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি তথা মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে থাকা সকল সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে জানা, বুঝা বা গ্রহণ করে কল্যাণপ্রাপ্ত হওয়ার জন্যে, অসংখ্য বিষয় রয়েছে 'উলিল আলবাবদের' জন্যে।

এরপর আল্লাহ 'উলিল আলবাব' কোন্ ব্যক্তিরা, তা বুঝানোর জন্যে তাদের দু'টো গুণের উল্লেখ করেন। যথা–

১. যারা দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন-এ সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। আমরা ২৪ ঘণ্টার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত এ তিন অবস্থার কোন একটা অবস্থায় থাকি। অর্থাৎ হয় দাঁড়িয়ে, না হয় বসে অথবা শায়িত থাকি। তাহলে আল্লাহ এখানে 'উলিল আলবাবদের' প্রথম গুণ হিসেবে যা বলেছেন তা হচ্ছে, তারা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহকে স্মরণ করে তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তারা আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলে বা যেভাবে চললে তিনি খুশি হন সেভাবে চলে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি হবে একজন প্রকৃত ঈমানদার।

২. যারা মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অর্থাৎ মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে উপস্থিত থাকা সকল বিষয়ের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে।

এ আয়াতটি থেকে তাহলে বুঝা যায়, 'উলিল আলবাব' পরিভাষা দিয়ে মহান আল্লাহ বুঝিয়েছেন মহাকাশ, পৃথিবী, রাত, দিন, গাছপালা, জীবজন্তু, নদ-নদী অর্থাৎ বিশ্ব জগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এমন ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে।

বিশ্ব জগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণার দু'টো স্তর আছে। যথা–

ক. সাধারণ চিন্তা-গবেষণা,
যেমন বিভিন্ন ধরনের ফুলের, গাছের বা জীবের বাহ্যিক সৌন্দর্য। একই মাটি ও বাতাস থেকে খাদ্য গ্রহণ করার পরও বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন রকম সুগন্ধ বা বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন রকম স্বাদ ইত্যাদি।

খ. বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা,
অর্থাৎ সৃষ্টি রহস্য নিয়ে আরো গভীর চিন্তা-গবেষণা।

তাহলে আল-কুরআনের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ আয়াতখানি থেকে সহজেই বুঝা যায়, আল-কুরআনের যে অসংখ্য জায়গায় উলিল আলবাব নামের এক গ্রুপের মানুষকে উদ্দেশ করে বক্তব্য রাখা হয়েছে, সেখানে সৃষ্টি জগৎ নিয়ে সাধারণ চিন্তা-ভাবনা করা সকল ঈমানদার অন্তর্ভুক্ত হলেও ঐ শব্দটির দ্বারা মহান আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে বা বিশেষভাবে ঈমানদার বিজ্ঞানীদেরকেই বুঝিয়েছেন।

এ আয়াত থেকে তাই সহজেই বুঝা যায়, মহান আল্লাহ বিজ্ঞানীকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। আর বিজ্ঞানীকে গুরুত্ব দেয়ার অর্থ হল বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়া।

❑❑ আল-কুরআনের এ সকল তথ্যের আলোকে তাই সহজেই বুঝা যায় কুরআন তথা ইসলাম বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে

ইসলামে বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার কারণ

পূর্বের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে, আল-কুরআন সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে তথা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান গবেষণাকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কেন আল্লাহ বিজ্ঞান গবেষণাকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন। এ গুরুত্ব দেয়ার প্রধান তিনটি কারণ হচ্ছে–

ক. তৌহিদের প্রতি ঈমান দৃঢ় হওয়া,

খ. কুরআন যে আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআনের সকল বক্তব্য ও তথ্য যে সত্য বা নির্ভুল তা প্রমাণিত হওয়া,

গ. আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হওয়া।

চলুন, এখন এ তিনটি বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক–

ক. তৌহিদের প্রতি ঈমান দৃঢ় হওয়া

❑ তৌহিদের প্রতি নবী-রাসূলগণের বিশ্বাস যেভাবে দৃঢ় করা হয়েছিল

এটা একটা সাধারণ কথা যে, কোন জিনিস নিজ চোখে দেখে বিশ্বাস করা আর তা না দেখে বিশ্বাস করার মধ্যে পার্থক্য অনেক। দেখে বিশ্বাস করলে বিশ্বাসটা যত দৃঢ় হয়, না দেখে বিশ্বাস করলে তা কখনও হয় না। আল্লাহ তথা তৌহিদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস সব থেকে দৃঢ় হতো যদি আল্লাহকে সরাসরি দেখা যেত। কিন্তু তাতো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আল্লাহকে সরাসরি দেখার অভাব অনেকাংশে পূরণ করে তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় করা যায় মহাবিশ্বের পরিচালনা পদ্ধতির গূঢ় রহস্যগুলো সরাসরি দেখার মাধ্যমে।

পৃথিবীতে তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস সব থেকে বেশি মজবুত ছিল নবী-রাসূলগণের (আ.)। আল্লাহ নবী-রাসূলগণের (আ.) তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস মজবুত করেছিলেন তাঁর সৃষ্টি রহস্য তথা মহাবিশ্ব তিনি কিভাবে পরিচালনা করছেন, তা দেখানোর মাধ্যমে। এ কথাটা তিনি আল-কুরআনের মাধ্যমে এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন :

তথ্য-১

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অর্থ : আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার রব, আমাকে দেখাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবে। (আল্লাহ) বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? (ইব্রাহীম) বললো, বিশ্বাস অবশ্যই করি কিন্তু দেখতে চাইছি সে বিশ্বাসটা মজবুত করার জন্যে (আল্লাহ তখন) বললেন, চারটি পাখি ধরে সেগুলোকে পোষ মানিয়ে নাও। তারপর সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর রেখে দাও অতঃপর সেগুলোকে ডাক দাও সেগুলো (আবার জীবিত হয়ে) উড়ে তোমার কাছে চলে আসবে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশীল এবং (সব ব্যাপারে) মহাজ্ঞানী। (বাকারা:২৬০)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)-এর তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস কিভাবে দৃঢ় করেছিলেন, এখানে তা উপস্থাপন করেছেন। বিষয়টা তিনি উপস্থাপন করেছেন ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে

মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে, ইব্রাহীম (আ.) তা আল্লাহর কাছে দেখতে চাইলেন। উত্তরে আল্লাহ বললেন, 'তোমার কি বিশ্বাস হয় না?' আল্লাহর এ প্রশ্নের উত্তরে ইব্রাহীম (আ.) বললেন, 'বিশ্বাস তো হয়, তবে সে বিশ্বাস আরো দৃঢ় করার জন্যে আমি বিষয়টা একটু দেখতে চাই।' তখন মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)কে ৪টা পাখিকে প্রথমে পোষ মানাতে বললেন। পরে তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে পাহাড়ের ওপরে রেখে আসতে এবং তারপর পাখিগুলোকে ডাকতে বললেন। ইব্রাহীম (আ.) ঐভাবে ডাক দেয়ার পর পাখিগুলো জীবিত হয়ে চলে আসল। এটা দেখে, আল্লাহ যে মৃতকে জীবিত করতে পারেন, এ বিষয়ে এবং তৌহিদের প্রতিও ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বাস ইস্পাতকঠিন দৃঢ় হয়ে গেলো।

তথ্য-২

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ.

অর্থ : আমি এভাবেই ইব্রাহীমকে মহাকাশ ও বিশ্বের পরিচালনা পদ্ধতির গূঢ় রহস্যগুলো দেখাতে লাগলাম, যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (আন-আম:৭৫)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, তিনি ইব্রাহীম (আ.)কে বিশ্ব জগতের পরিচালনা পদ্ধতির গূঢ় রহস্যগুলো সরাসরি দেখিয়েছেন। আল্লাহ এখানে এটাও উল্লেখ করেছেন যে, এটা তিনি করেছেন ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বাস অর্থাৎ ঈমান দৃঢ় করার জন্যে।

তথ্য-৩

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا.

অর্থ : পবিত্র সেই সত্তা যিনি এক রাত্রে তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম হতে দূরবর্তী সেই মসজিদ (মসজিদে আকসা) পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। যার চতুর্পার্শ্বকে বরকতময় করা হয়েছে। যেন তিনি নিজের কিছু নিদর্শন তাকে দেখাতে পারেন। (বনী ইস্রাইল:১)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আয়াতটিতে আল্লাহ রাসূল (সা.)কে মে'রাজে নেয়ার পেছনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যটা বর্ণনা করেছেন। সে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, রাসূল (সা.)কে বিশ্ব জগৎ পরিচালনার কিছু নিদর্শন দেখানো। আর এটা দেখানোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঈমান দৃঢ়তর করা, তা পূর্বোল্লিখিত কুরআনের দুটো তথ্য থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জেনেছি

তাহলে এটা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, রাসূল (সা.)কে মে'রাজের নেয়ার পেছনে আল্লাহর প্রধান উদ্দেশ্যটা ছিলো বিশ্ব জগৎ পরিচালনার কিছু নিদর্শন সরাসরি দেখিয়ে তাঁর ঈমানকে ইস্পাতদৃঢ় করা।

আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, নবী-রাসূল (সা.)গণের ঈমান ইস্পাতদৃঢ় থাকা বা হওয়ার পেছনে মূল কারণটি ছিল মহাবিশ্ব কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তথা মানুষের দৃষ্টির অগোচরে থাকা মহাবিশ্বের পরিচালনা পদ্ধতির গূঢ় রহস্যসমূহ স্বচক্ষে দেখা। আর সে দেখানোর ব্যবস্থা আল্লাহ নিজেই করেছিলেন।

❑ সাধারণ মানুষের ঈমান দৃঢ় করা বা হওয়ার উপায়

সাধারণ মানুষের ঈমান দৃঢ় করার জন্যে মহাবিশ্বের পরিচালনা পদ্ধতির গূঢ় রহস্যগুলো তাদের সরাসরি দেখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। কিন্তু সে কাজটি তিনি করেছেন আল-কুরআনের মাধ্যমে সৃষ্টি জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে। কারণ, সৃষ্টি জগৎ নিয়ে যে যতো গভীর চিন্তা-গবেষণা করবে, তার ঈমান ততো মজবুত হবে। একজন সাধারণ মানুষ যদি সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন জিনিসের বাহ্যিক রূপ, সৌন্দর্য, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি নিয়েও চিন্তা-গবেষণা করে তাহলেও ঈমানদার হলে তৌহিদের প্রতি অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, জ্ঞান ইত্যাদির প্রতি তার বিশ্বাস মজবুত হবে। আর যদি কেউ সৃষ্টি জগৎ নিয়ে আরো গভীর চিন্তা-গবেষণা করে

অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা করে, তবে ঈমানদার হলে তৌহিদের প্রতি তার বিশ্বাস (ঈমান) আরো মজবুত হবে, সৃষ্টির মধ্যকার অপূর্ব কলাকৌশল দেখে আর এই বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা যে যতো গভীরভাবে করতে পারবে, তার ঈমানও ততো মজবুত হবে। মানুষের শরীরের মধ্যকার আল্লাহর তৈরি অপূর্ব কলা-কৌশল দেখে একজন ঈমানদার ডাক্তারের ঈমান যেমন মজবুত হয়, তেমনই অণু-পরমাণুর মধ্যকার অপূর্ব সৃষ্টি রহস্য দেখে একজন ঈমানদার পরমাণু বিজ্ঞানীরও ঈমান মজবুত হয়

আল-কুরআনে সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে এটি অর্থাৎ ঈমানদারদের ঈমানকে মজবুত করা।

খ. কুরআন যে আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআনের সকল বক্তব্য যে সত্য বা নির্ভুল, তা প্রমাণিত হওয়া

আল-কুরআন যে সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহর কিতাব তথা আল-কুরআনের সকল বক্তব্য যে চিরসত্য, তা প্রমাণ করার বা প্রমাণিত হওয়ার প্রধান দু'টি উপায় হচ্ছে–

১. কুরআনের সাহিত্য মান

আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব কিনা বা তা কোন মানুষের লেখা কিতাব কিনা, এ ব্যাপারে মানুষের মনের সন্দেহ দূর করার জন্যে আল্লাহ কুরআনের অনেক জায়গায় চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, আল-কুরআন যদি মানুষের লেখা কিতাব হয়ে থাকে, তবে তোমরা সব মানুষ মিলে এর সমতুল্য একটা সূরা বা আয়াত বানিয়ে দেখাও যেমন সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অর্থ : আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছি, (তা আমার কিতাব কিনা) তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার সমতুল্য একটা সূরা রচনা করে আন। এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও সাহায্য করার জন্যে ডেকে নাও। তোমাদের (সন্দেহ) সত্য হলে এ কাজ অবশ্যই করে দেখাবে।

আজ পর্যন্ত কুরআনের সমতুল্য একটি আয়াতও কেউ বানাতে পারেনি আর কিয়ামত পর্যন্ত তা কেউ পারবেও না। কুরআন যে আল্লাহর কিতাব, তার পক্ষে এটা অবশ্যই একটা বড় প্রমাণ

২. কুরআনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের কিছু দিক উল্লেখ থাকা এবং তা চিন্তা-গবেষণা করার গুরুত্ব দেয়া

আল-কুরআনে আল্লাহ একদিকে বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয়, ব্যাপক অর্থবোধক, ইঙ্গিত বা রূপক আকারে বর্ণনা করে রেখেছেন। আর অন্যদিকে কুরআনে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে সবাইকে চিন্তা-গবেষণা করতে হয় নির্দেশ দিয়েছেন, না হয় তা না করার জন্যে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন।

এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, কুরআন যে আল্লাহর কিতাব, তা প্রমাণিত হওয়ার ব্যবস্থা রাখা। কারণ, মানুষ ঐ ইঙ্গিতগুলোকে মূল ধরে যতো চিন্তা-গবেষণা করবে, ততো বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয় আবিস্কৃত হবে। আর সে আবিষ্কার যদি সঠিক হয়, তবে তা কুরআনে উল্লেখিত মূল তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। ফলে কুরআন যে আল্লাহর কিতাব, তা প্রমাণিত হবে। কারণ, মানব সভ্যতার যে সময়ে কুরআন নাযিল হয়েছে, তখন বিজ্ঞানের ঐ অসংখ্য বিষয়ের মূল দিকগুলো নির্ভুলভাবে কোনো বইয়ে লিখে রাখা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কুরআন আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ তার সব বক্তব্য বা তথ্য নির্ভুল তা প্রমাণিত হওয়ার কল্যাণসমূহ–

- ❑ মানব জীবনের সব দিক (ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বিজ্ঞান ইত্যাদি) সম্বন্ধে কুরআনে উল্লেখিত তথ্য বা বক্তব্যগুলো নিশ্চিন্ত মনে মেনে নেয়া যাবে,
- ❑ মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করা যাবে,
- ❑ দৃঢ়পদে তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যাবে,
- ❑ নিশ্চিন্ত মনে বা দৃঢ়মনে অন্যকে তা বলা বা বুঝানো যাবে অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াতি কাজ করা যাবে।

আল-কুরআনে উল্লিখিত বিজ্ঞানের ইঙ্গিতগুলোর কয়েকটি পরে উল্লেখ করা হবে। আর সকল ইঙ্গিত সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবেন, এম. আকবার আলী, প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী, প্রফেসর ডাঃ গোলাম মোয়াজ্জম এবং অন্যান্যের লেখা SCIENTIFIC INDICATIONS IN THE HOLY QURAN নামক বইটির মাধ্যমে।

গ. মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্ত

বায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' নামক বইটিতে।

কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত ন্যায় ও অন্যায় কাজের কয়েকটি হল–

১. সকল মুসলমান নর-নারীকে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআনে উল্লিখিত জীবনের সকল দিকের (উপাসনা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার-ব্যবহার, প্রতিরক্ষানীতি ইত্যাদি) চিরসত্য জ্ঞানটুকু অর্জন করা। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি, 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের ১ নং কাজ কোনটি ও শয়তানের ১ নং কাজ কোনটি' নামক বইটিতে

২. নামাজ কায়েম করা অর্থাৎ নামাজের শিক্ষা মুসলমানদের ব্যক্তিগত এবং সমাজ জীবনে কায়েম করা (সূরা বাকারা-আয়াত ৩ ও ১৭৭ এবং কুরআনের আরো অনেক জায়গা)। বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' নামক বইটিতে।

৩. যাকাত আদায় করা অর্থাৎ বঞ্চিতদের কল্যাণ ও সুষম বণ্টনভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা (বাকারা ১৭৭ আয়াত ও আরো অনেক জায়গায়)

৪. রোজা রাখা এবং সবাই যাতে ভালভাবে রোজা রাখতে পারে ও রোজার শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং রোজার ক্ষতি হয় এমন সকল কাজ বন্ধ করা। (বাকারা ১৮৩ ও ১৮৫ আয়াত)

৫. হজ্জ করা এবং ধনী মুসলমানরা যাতে সহজে হজ্জ করতে পারে এবং হজ্জের শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা (আল-ইমরা:৯৭)

৬. ধনীদের কর্তব্য, গরিব বা বঞ্চিত আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও দেশবাসীকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা এবং ধনীর সঞ্চিত অর্থ সম্পদের ২.৫% এবং ফসলের ৫ থেকে ১০% বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করে সমাজের বঞ্চিতদের কল্যাণে ব্যয় করা। (সূরা বাকারা:১৭৭, নিসা:৩৬, তওবা:৬০)

৭. অবৈধ যৌনাচার চলতে থাকলে একদিন পৃথিবীতে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই এটা বন্ধের জন্য, নির্লজ্জভাবে অবৈধ যৌনাচারকারী বিবাহিত নারী-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা এবং অবিবাহিত নারী-পুরুষকে প্রকাশ্যে অপমানকর শাস্তি প্রদান করা। অবৈধ যৌনাচার কিভাবে মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারে, সে ব্যাপারে পরে লেখার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ (নূর:২)

৮. কোটি কোটি মানুষকে অবৈধ হত্যা থেকে বাঁচানোর জন্যে অবৈধ হত্যাকারীকে তাড়াতাড়ি বিচার করে জনসমক্ষে হত্যা করা। এটাকে কুরআনে 'কেসাস' বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, এই কেসাস-এর আইন হচ্ছে তোমাদের জীবন। (বাকারা:১৭৯)

৯. ধনীরা চুরি করলে তাদের হাত কেটে দেয়ার ব্যবস্থা করা। পেটের দায়ে কেউ চুরি করলে তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে বরং চুরির কারণটা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা (মায়েদাহ:৩৮)

১০. সুদী অর্থ ব্যবস্থা উৎখাত করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এ জন্যে দরকার হলে যুদ্ধ ঘোষণা করা কারণ, সুদ হচ্ছে সমাজের বিত্তবানদের দ্বারা বিত্তহীনদের শোষণের ব্যবস্থা। (বাকারা:২৭৯)

১১. সব ধরনের অশ্লীল কাজকে প্রতিরোধ করা। (নাহল:৯০)

১২. ঘুষ, দুর্নীতি, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি কাজকে প্রতিরোধ করার জন্যে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (নাহল:৯০)

১৩. সমাজ থেকে সব ধরনের জুলুম ও অত্যাচারকে উৎখাত করা এবং এর জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা। (নিসা:৭৫)

১৪. মানুষের কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা। (আল-ইমরান:১৯১)

উপরে বর্ণিত ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআনে হুবহু সেভাবে বর্ণনা করা নেই। কুরআনের মৌলিক নির্দেশের সঙ্গে হাদীসের ব্যাখ্যা এবং রাসূল (সা.) ও পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামগণ যেভাবে সেটা বাস্তবে রূপদান করেছেন, তা মেলালে যেটা দাঁড়ায়, সেভাবে নির্দেশগুলো উল্লেখ করা হয়েছে

সাধারণ জ্ঞানেই সহজে বুঝা যায় উপরে বর্ণিত ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোর দু'চারটির বাস্তবায়ন বা প্রতিরোধ যে কোনো স্থানে বা দেশে করা সম্ভব। কিন্তু ওই কাজগুলোসহ কুরআনে উল্লেখিত অন্য সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করতে হলে ইসলামকে সেখানে বা সে দেশে অবশ্যই বিজয়ী তথা শাসন ক্ষমতায় থাকতে হবে। এ কথাটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন নবী-রাসূলগণদের পাঠানোর উদ্দেশ্য জানানোর মাধ্যমে। নবী-রাসূলগণকে পাঠান হয়েছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে, যেন তাঁদের ইন্তেকালের পরে মানুষ সেভাবে তা বাস্তবায়ন করে যেতে পারে। নবী-রাসূলগণের পাঠানোর উদ্দেশ্য আল-কুরআনে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখিত হয়েছে-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه.

অর্থ : তিনিই সেই সত্তা (আল্লাহ), যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বিন (জীবন ব্যবস্থা) সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সকল দ্বিনের উপর বিজয়ী করতে পারেন (তওবা:৩৩, ফাতহ:২৮, হুফ:৯)

চলুন এখন, ইসলামকে বিজয়ী করা ও থাকা তথা ইসলামকে শাসন ক্ষমতা বসা ও থাকার জন্যে কোন্ কোন্ জিনিস কী কী পরিমাণে প্রয়োজন হবে বলে কুরআন ও হাদীস বলেছে তা জানা যাক–

আল-কুরআন

তথ্য-১

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ. الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ.

অর্থ: হে নবী, মুমিনদের যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন লোক দৃঢ় পদ থাকে, তবে তারা দু'শত জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর যদি একশত লোক এমন থাকে, তবে তারা সত্য অমান্যকারীদের এক হাজার লোকের ওপর বিজয়ী হতে পারবে। কারণ, তারা নির্ভুল জ্ঞান রাখে না। এভাবে আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। তবে তিনি জেনে নিয়েছেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশত লোক দৃঢ়পদ হয়, তবে তারা দু'শতের ওপর বিজয়ী হবে এবং এক হাজার লোক এরকম হলে, তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজারের ওপর বিজয়ী হবে। (আনফাল:৬৫-৬৬)

ব্যাখ্যা: আয়াত দু'টির মাধ্যমে আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জয়ী হতে হলে কী কী জিনিস লাগবে এবং ঐ জিনিসের মধ্যে পারস্পরিক অনুপাত কী হবে, তা জানিয়ে দিয়েছেন

প্রথমে আল্লাহ বলেছেন, মুসলমানদের ঈমান দৃঢ় হলে তারা তাদের থেকে দশ গুণ বেশি সংখ্যক কাফের সৈন্যের ওপর যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে আর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে তারা জীবন সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান রাখে না।

তারপর বলা হয়েছে, ঈমান দুর্বল হলে মুসলমানরা তাদের থেকে দু'গুণ বেশি সংখ্যক কাফের সৈন্যদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্যে।

আয়াত দুটো থেকে তাই বুঝা যায়–

i. শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে সত্যিকার মুসলমানদের চারটি বিষয়ের দরকার হবে। যথা–

১. ঈমান,
২. জীবন সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান,
৩. জনশক্তি এবং
৪. আল্লাহর সাহায্য,

ii. বিজয়ী হওয়ার জন্যে ঈমান ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক হবে–

❑ **দৃঢ় ঈমান-১ ঃ ১০**

অর্থাৎ ঈমান দৃঢ় হলে ১ জন মুসলমান সৈন্য দশজন কাফের সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে পারবে।

❑ **দুর্বল ঈমান-১ ঃ ২**

অর্থাৎ ঈমান দুর্বল হলে ১ জন মুসলমান সৈন্য কেবল ২ জন কাফের সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হতে পারবে।

iii. আল্লাহর সাহায্য

আল্লাহর সাহায্যের কথাটা আয়াত দু'টিতে ঈমান, নির্ভুল জ্ঞান ও সৈন্যশক্তির পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকে বুঝা যায়, বিজয়ী হওয়ার জন্যে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই লাগবে, তবে সে সাহায্য আসবে প্রথম বিষয় তিনটি (ঈমান, নির্ভুল জ্ঞান ও সৈন্য শক্তি) উপস্থিত থাকলে। ঈমান, নির্ভুল জ্ঞান ও সৈন্য শক্তির উপরোক্ত আনুপাতিক হার উপেক্ষা করেও মুসলমানদের বিজয়ী করে দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহর আছে তবে বিশেষ অবস্থা ছাড়া আল্লাহ নিজের সেই সংরক্ষিত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না কারণ, আল্লাহ আল-কুরআনের মাধ্যমে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। নিজের

বানানো নিয়ম নিজেই যখন-তখন ভঙ্গ করা কোন ভালো শাসকের কাজ নয়। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসক আল্লাহর তাঁর নিজের তৈরি নিয়ম-কানুন ঘন ঘন না ভাঙারই কথা।

তথ্য-২

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط

অর্থ: আর তোমরা তাদের (শত্রুদের) জন্যে প্রস্তুত করে রাখো যথাসম্ভব শক্তি এবং সদাসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী যেন এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুরা এবং এমন শত্রুরা যাদের তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ জানেন, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। (আনফাল:৫০)

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমার প্রথম অংশে আল্লাহ অমুসলমানদের তাদের শত্রুদের জন্যে দু'টি জিনিস প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন। জিনিস দু'টি হল–

১. (বস্তুগত) শক্তি এবং

২. সদাসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী তথা সজ্জিত সামরিক বাহিনী।

বস্তুগত শক্তির কথাটি মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট (Specific) ভাবে না বলে উন্মুক্ত (Open) ভাবে বলেছেন। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আল্লাহ যত ধরনের শক্তির প্রয়োজন তার সব ধরনের কথাই বলেছেন। যুগের চাহিদা অনুযায়ী শক্তির ধরন পাল্টিয়ে যাবে বলেই আল্লাহ কথাটি ঐভাবে উল্লেখ করেছেন। মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে সহজেই বলা যায় এই বস্তুগত শক্তির মধ্যে থাকতে হবে–

১. অর্থনৈতিক শক্তি,

২. সামরিক বস্তুগত শক্তি তথা রাইফেল, কামান, মিসাইল, ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান, সাবমেরিন, সাধারণ বোমা, আণবিক বোমা ইত্যাদি

৩. প্রচার শক্তি,

৪. চিকিৎসাসহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শক্তি ইত্যাদি।

আয়াতে কারীমার দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ শত্রুদের জন্যে কী মান এবং পরিমাণের বস্তুগত সামরিক শক্তি রাখতে হবে, তা সাধারণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, মুসলমানদের বস্তুগত শক্তি অর্থাৎ রাইফেল, কামান, ট্যাংক, মিসাইল, বিমান, সাবমেরিন, সাধারণ বোমা, আণবিক বোমা, অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, প্রচার, শিল্প ইত্যাদি এবং সামরিক জনশক্তি এমন মান

ও পরিমাণের হতে হবে যেন, তাদের জানা-অজানা শত্রুরা তা জেনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। বর্তমান যুগের আমেরিকা, ইউরোপ বা রাশিয়া, বহু বছর আগেকার মান এবং সামান্য পরিমাণের যুদ্ধাস্ত্র দেখে নিশ্চয়ই ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। তাহলে আল্লাহ এখানে মুসলমানদের বলেছেন, তাদের জানা-অজানা শত্রুদের জন্যে যুগ অনুযায়ী এমন মান এবং পরিমাণের বস্তুগত শক্তি যোগাড় করে রাখতে যেন তা জেনে শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে বলেছেন, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে মুসলমানদের শত্রুদের চেয়ে উন্নত মান ও পরিমাণের বস্তুগত শক্তি তৈরি ও মওজুদ করে রাখতে হবে। তাদের সৈন্যদের মানও শত্রুসৈন্যদের মানের চেয়ে উন্নত হতে হবে।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ عَلَي الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَ اَعِدُوْا لَهُمْ مَا سْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . رواه مسلم

অর্থ: হজরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন : আমি রাসূল (সা.)কে মসজিদে নববীর মেম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে শুনেছি : তোমরা শত্রুদের জন্যে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। জেনে রাখ প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা! (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) এ হাদীসখানির মাধ্যমে প্রথমে শত্রুদের জন্যে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করতে বা অর্জন করে রাখতে বলেছেন।

এরপর তিনি তীর [দূরে নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র (Missile)] নিক্ষেপ করার মধ্যে প্রকৃত বা সবচেয়ে বেশি (বস্তুগত) শক্তি রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আর কথাটির গুরুত্ব অর্থাৎ তীরের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি বস্তুগত শক্তি রয়েছে, তা বুঝানোর জন্যে তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন।

তীর ছিল রাসূল (সা.) এর সময় যুদ্ধ জয়ের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। তাহলে পুরো হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, শত্রুরা যাতে আক্রমণ করতে সাহস না পায় বা তাদের আক্রমণ যেন প্রতিহত করা যায় অথবা দরকার হলে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করা যায়- এ জন্যে যুগোপযোগী অস্ত্র শক্তি প্রস্তুত রাখতে। আর বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাসূল (সা.)-এর এ

হাদীসটি পূর্বে উল্লিখিত আল-কুরআনের ১ নং তথ্যের সরাসরি ব্যাখ্যা বলেই মনে হয়।

তথ্য-২

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ تَعَالٰي يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلٰثَةَ نَفَرٍ اَلْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَ مُنَبِّلَهُ وَ اَرْمُوْا وَارْكَبُوْا وَ اَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُوْبِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ اِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيْبَهِ فَرَسَهُ وَ مُلاَعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَاِنَّهُنَّ مُنَ الْحَقِّ . رواه الترمذي و ابن ماجة وَ زَادَ اَبُوْ دَاؤدَ وَالدَّارِ مِيُّ وَ مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلَيْهِ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهُ نِعْمَةً تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا .

অর্থ : হজরত ওকবা ইবনে আমর (রা.) বলেন, তিনি রাসূল (সা.) কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এক তীরের অপেক্ষায় তিন ধরনের লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন– তীরের প্রস্তুতকারী যে সওয়াবের নিয়াতে তা তৈরি করে, তীর নিক্ষেপণকারী এবং তীর প্রদানকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজী ও সওয়ারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। অবশ্য তোমাদের তীরন্দাজী প্রশিক্ষণ আমার নিকট সওয়ারী প্রশিক্ষণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। মানুষের সকল প্রকার খেল-তামাশা বাতিল ও অন্যায়। ব্যতিক্রম হল– ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা, ঘোড়াকে যুদ্ধের শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

আবু দাউদ ও দারেমী এ কথাটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন– যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করার পর অবহেলা বা অনীহা করে তা পরিত্যাগ করে সে যেন আল্লাহর একটি নিয়ামত পরিত্যাগ করল অথবা তিনি বলেছেন, সে আল্লাহর একটি নিয়ামত অস্বীকার করল।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন যারা সওয়াবের আশায় অর্থাৎ দীনকে বিজয়ী করার বা বিজয়ী রাখার জন্যে, তীর (Missile) তথা যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করার জন্যে গবেষণা করবে, প্রস্তুত করে তা যোগান

(Supply) দিবে এবং তা ব্যবহার করবে, তাদের আল্লাহ তায়ালা পরকালে বেহেশত দিবেন কারণ, যুদ্ধাস্ত্র হচ্ছে দীনকে বিজয়ী করে বা বিজয়ী রেখে মানব সমাজের সার্বিক ও স্থায়ী কল্যাণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত উপায়।

তথ্য-৩

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..

رواه البخاري

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে (জেহাদের জন্যে) ঘোড়া আবদ্ধ রাখে (লালন-পালন করে) কিয়ামতের দিন সেই ঘোড়ার খাবার ও পানীয়, গোবর ও পেশাব, ঐ ব্যক্তির পাল্লায় ওজন করা হবে।

(বুখারী)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.)-এর সময় ঘোড়া ছিল যুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাহন। তাই রাসূল (সা.) এখানে বলেছেন, যে ঈমানদার আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা বা রাখার জন্যে অর্থাৎ মানব সমাজের সার্বিক ও স্থায়ী কল্যাণের জন্যে ঘোড়া অর্থাৎ যুদ্ধের বাহনস্বরূপ দরকারি উৎকৃষ্ট মানের বাহন, (বর্তমান যুগে সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাংক, প্লেন ইত্যাদি) তৈরি, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে, পরকালে আল্লাহ তাকে অনেক পুরস্কার দিবেন।

(বুখারী)

❑❑ তাহলে কুরআন, হাদীস ও সাধারণ জ্ঞানের আলোকে ইসলামকে বিজয়ী করা বা রাখার জন্যে যে সকল জিনিস প্রয়োজন হবে বলে জানা যায়, তা হচ্ছে–

১. ঈমানী শক্তি,
২. কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান,
৩. উন্নত মানের সামরিক জনশক্তি,
৪. মান অনুযায়ী যথাযথ সংখ্যার সামরিক জনশক্তি (১০ঃ১ বা ২ঃ১),
৫. শত্রুদের চেয়ে উন্নত মান ও অধিক পরিমাণের বস্তুগত শক্তি : যার মধ্যে থাকবে-

ক. অর্থনৈতিক শক্তি,
খ. সামরিক বস্তুগত শক্তি,
গ. প্রচার শক্তি (I.T.),
ঘ. চিকিৎসাসহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শক্তি।

৬. আল্লাহর সাহায্য

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি–

১. বিজ্ঞান ঈমানকে দৃঢ় করে,
২. (আরবী জানা থাকলে) ঈমানদার বিজ্ঞানীরা কুরআন ও হাদীস বেশি বুঝতে পারবেন।

অন্যদিকে সামরিক বস্তুগত শক্তি, প্রচার শক্তি (I.T.), চিকিৎসাসহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শক্তি বিজ্ঞান গবেষণা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। আবার অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের জন্যে বিজ্ঞান অপরিহার্য। বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব (Industrial revdation) করেই বর্তমান বিশ্বের ধনী দেশগুলো ধনী হয়েছে।

এ সকল তথ্য থেকে তাই সহজেই বুঝা যায়, মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। এ জন্যেই কুরআন তথা ইসলাম বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে।

আল-কুরআনে উল্লেখ থাকা বিজ্ঞানের কিছু বিষয়

❑ যেগুলো ইতোমধ্যে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তার কয়েকটি

ক. মায়ের গর্ভে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির ক্রমবিকাশ

মাতৃগর্ভে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়ত্তে এসেছে খুব বেশি দিনের কথা নয়। আর এটা সম্ভব হয়েছে মানব দেহের ভিতরের বিভিন্ন অংশের প্রতিচ্ছবি (Image) নেয়ার উন্নত প্রযুক্তি এবং অণুবিক্ষণ যন্ত্র মানুষের আয়ত্তে আসার পরে। এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাতৃগর্ভের মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির ক্রমবিকাশের যে তথ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্তমানে জানতে পেরেছে, তা সাধারণভাবে উপস্থাপন করলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে–

১. ভ্রূণের শুরু

মানব ভ্রূণের শুরু হয় পুরুষের শুক্র (Sperm) এবং মহিলার ডিম্বের (Ovum) মিলনের মাধ্যমে শুক্র ও ডিম্বের এই মিলন হয় মহিলাদের টিউবের (Fallopian Tube) মধ্যে শুক্র ও ডিম্বের মিলনের পর যে ভ্রূণ তৈরি হয়,

সেটা প্রথমে দেখা যায় তরল পদার্থের ফোঁটার মতো মহিলাদের পরিপক্ব ডিম্বও (Matured ovum) তরল পদার্থের ফোঁটার মতো দেখা যায়। শুক্র যে তরল পদার্থের (Semen) মধ্যে থাকে, সেটাও পুরুষের থেকে বের হওয়ার সময় তরলের ফোঁটা আকৃতিতে বের হয়।

২. পরের স্তর

গঠিত ভ্রূণ (Zygote) টিউবের মধ্যদিয়ে গড়াতে গড়াতে মায়ের জরায়ুর (Uterus) মধ্যে পৌঁছে জরায়ুতে পৌঁছে ভ্রূণ জরায়ুর গা হতে শক্তভাবে ঝুলে থাকে। গঠনের পর থেকেই ভ্রূণের বৃদ্ধি (Development) চলতে থাকে।

৩. এর পরের স্তর

পরের স্তরে বৃদ্ধি হয়ে ভ্রূণ যে আকৃতি ধারণ করে, তা দেখতে দাঁত দিয়ে চিবানো মাংসের মতো হয় যাতে জোড়া দাঁতের ছাপ পড়ে থাকে।

৪. পরের স্তর

এ স্তরে হাড় (Bone) তৈরি হয়। ছয় সপ্তাহের শুরু থেকে হাত ও পায়ের নরম হাড় (Certlage) তৈরির মাধ্যমে হাড় তৈরি শুরু হয় এবং ১২ সপ্তাহের মধ্যে শরীরের পুরো অস্থি (Skeletal System) প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়ে আকারে এসে যায়।

৫. পরের স্তর

অস্থিকে মাংস দিয়ে আচ্ছাদনের স্তর। ভ্রূণের মাংস তৈরি আরম্ভ হয় হাড় তৈরি আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে। কিন্তু সপ্তম সপ্তাহের শেষ হতে ৮ম সপ্তাহের আগে মাংস হাড়ের চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ করে না।

৬. পরিপূর্ণ বৃদ্ধির পর ভ্রূণের আকার

পরিপূর্ণ বৃদ্ধির (Full Development) পর ভ্রূণ (Foetus) যে আকার (Shape) গ্রহণ করে, তা প্রথম দিকের আকৃতির সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এবার চলুন দেখা যাক, আল-কুরআন মায়ের গর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে কী বলেছে। সূরা মু'মিনের ১২-১৪ নং আয়াতে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِيْنٍ . ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط

অর্থঃ আমি মানুষকে মাটির উপাদান থেকে তৈরি করেছি। পরে তাকে ফোঁটায় পরিণত করে এক বিশেষ সংরক্ষিত স্থানে স্থাপন করেছি। পরে সেই ফোঁটাকে কোন স্থান থেকে শক্তভাবে ঝুলে থাকা বস্তুতে (আলাকাহ) পরিণত করেছি। পরে সে বস্তুকে চিবানো গোশতের ন্যায় বস্তুতে (মুদগাহ) পরিণত করি। এরপর সেখানে অস্থি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি

ব্যাখ্যাঃ সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে, আল-কুরআন কোন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। তাই সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারে। আয়াতখানিতে ১৪শ' বছর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবে মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা, ক্রম অনুযায়ী যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা পূর্বে উপস্থাপিত বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে মিলালে দেখা যায়, দুয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

খ. বিমান ও বিমান যুদ্ধ

মানব ইতিহাসে প্রথম সফল বিমান উড্ডয়ন করে ইতিহাস সৃষ্টি করে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (Wright Brothers) ১৯০৩ সালে। আর বিমান থেকে বোমা ফেলে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা প্রকৃত অর্থে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কিন্তু আল-কুরআন বিমান থেকে বোমা ফেলে যুদ্ধ করার কথা বর্ণনা করেছে আজ থেকে ১৪শ' বছর আগে চলুন এখন আল-কুরআনের ভাষায় জানা যাক সেই বিমান যুদ্ধের অপূর্ব বর্ণনা–

أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.

অর্থ : তুমি কি দেখনি, তোমার রব হাতিওয়ালাদের সঙ্গে কী পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছেন? তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে নিষ্ফল করে দেননি? আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন। যারা তাদের ওপর ছিজ্জিল দিয়ে তৈরি পাথর নিক্ষেপ করেছিলো। সে পাথরের আঘাতে তারা (পশুর) ভক্ষণ করা ভুসার মতো হয়ে গিয়েছিল। (সূরা ফিল)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল (সা.)-এর জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে ইয়ামেনের সম্রাট আবরাহা অনেক হাতিসহ ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্যে এসেছিলো। আবরাহার সেই সৈন্যবাহিনীকে কী পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে আল্লাহ সম্পূর্ণ ধ্বংস

করে দিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে এই সূরাটির মাধ্যমে। আল্লাহ এখানে রূপকভাবে 'বিমানের' পরিবর্তে 'পাখি' এবং 'বোমার' পরিবর্তে 'পাথর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ, বিমান ও বোমার জ্ঞান মানব সভ্যতার আয়ত্তে আসার আগে ঐ শব্দ দুটো ব্যবহার করলে মানুষ তা বুঝতে পারতো না। শানে নুযুল এবং রূপক শব্দের প্রকৃত অর্থ ধরে তরজমা করলে সূরাটির অর্থ দাঁড়ায়–

'তুমি কি দেখনি, হস্তিবাহিনীর সঙ্গে তোমার রব কী পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছিলেন? তিনি কি তাঁর অপূর্ব যুদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেননি? আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল নামের বিমান বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। ঐ বিমান বাহিনী শত্রুদের ওপর ছিজ্জিল দিয়ে তৈরি বোমা নিক্ষেপ করেছিলো সে বোমার আঘাতে শত্রু বাহিনী ভক্ষণ করা ভুসার মতো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।'

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কী অপূর্বভাবে মহান আল্লাহ আজ থেকে ১৪শ' বছর আগে বিমান যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুদের ধ্বংস করার কথা বর্ণনা করেছেন। মুসলমানরা যদি এই ইঙ্গিত ধরে গবেষণা করতো, তবে বিমান এবং বোমা তারাই প্রথমে আবিষ্কার করতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তবতা তার উল্টো।

গ. মদের অপকারিতা ও উপকারিতা

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে মদের অপকারিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে মানুষেরা যা জানতে পেরেছে তা হচ্ছে–

অপকারিতা

- ❑ বেশি মদ খেয়ে মাতাল হওয়া ব্যক্তি নানারকম দুর্ঘটনা ঘটানোর কারণ হয়,
- ❑ মদ খেলে লিভার সিরোসিস (Liver cirrhosis) হয়,
- ❑ মদ খেলে অগ্নাশয়ে প্রদাহ (Pancreatitis) হয়,
- ❑ মদ খেলে আলসার (Peptic ulcer) হয়,
- ❑ মদ খেলে কোন কোন স্থানে ক্যানসার হতে পারে,
- ❑ বেশী মদ খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো বা মাতলামি করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়, তো আছেই।

উপকারিতা: কিছু কিছু রক্তের শিরার অসুখে মদ কিছুটা উপকার দেয়

অর্থাৎ ডাক্তারী বিজ্ঞানের বর্তমান স্তরের জ্ঞানের সাহায্যে বলা যায়, মদে রয়েছে অনেক অপকারিতা এবং কিছু উপকারিতা।

চলুন এখন দেখা যাক, ১৪শ' বছর আগে মদ সম্বন্ধে আল-কুরআন কী বলেছে–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ: তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, ঐ দুটো জিনিসে মানুষের জন্যে রয়েছে অনেক অপকারিতা এবং কিছু উপকারিতা এবং ওর অপকারিতা উপকারের তুলনায় অনেক বেশি। তারা আরো জিজ্ঞাসা করে, আমরা (আল্লাহর পথে) কী খরচ করব? বল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (কোন বিষয়ে) তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন। যাতে তোমরা (ঐ মূল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে) চিন্তা-গবেষণা করতে পার।
(বাকারা:২১৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে মদ ও জুয়ার অপকারিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বলেছেন, মদ ও জুয়ায় রয়েছে অনেক অপকারিতা এবং কিছু উপকারিতা। তিনি আরো বলেছেন, মদ ও জুয়ার খারাপ দিকটা ভালো দিকের থেকে অনেক বেশি। তারপর তিনি বলেছেন, আল-কুরআনের এসব বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে। কারণ, তা করলে মানুষ জানতে পারবে, ঐ সব অপকারিতা ও উপকারিতা কী কী এবং তাতে মানব সভ্যতা উপকৃত হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, আজ থেকে ১৪শ' বছর আগে আল-কুরআন মদ সম্বন্ধে যা বলে রেখেছে, আজ বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হচ্ছে। আমার মনে হয়, মদ নিয়ে গবেষণা চালু রাখলে মদের আরো অনেক অপকারিতা বা খারাপ দিক আবিষ্কার হবে। কী নির্ভুল কুরআনের বক্তব্য, তাই না?

ঘ. ভিডিও ক্যামেরা (Video Camera)

স্যাটেলাইট (Sattelite) থেকে ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে ছবি নিয়ে কোন কাজকে ধারণ করে রাখার প্রযুক্তি মানুষের আয়ত্তে এসেছে অল্প দিন আগে। বর্তমান বিশ্বের বৃহৎ ও উন্নত দেশগুলো স্যাটেলাইট ও ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে পৃথিবীর কোন্ দেশে কী কী কাজ হচ্ছে, তা রেকর্ড করছে এবং সেই রেকর্ড দেখে তাদের করণীয় ঠিক করছে এবং মানুষকেও তা জানাচ্ছে। এই প্রযুক্তি বর্তমানে ঘরের বাইরের বড় বড় কাজকে রেকর্ড করতে পারে কিন্তু ঘরের মধ্যের ছোট ছোট বা সূক্ষ্ম কাজকে রেকর্ড করতে পারে না। কোন মানুষের পুরো

জীবনটা পর্যালোচনা করে সঠিক পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হলে, তার পুরো জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের কর্মকাণ্ডের নিখুঁত ভিডিও রেকর্ড করা থাকলে, বিচার কাজ সহজ ও নির্ভুল হবে আশা করি, কথাটার সাথে কেউ দ্বিমত করবেন না।

মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষের জীবনের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সব কর্মকাণ্ডের ভিডিও রেকর্ড রাখছেন এবং সেই ভিডিও রেকর্ডিং দেখিয়ে শেষ বিচারের দিন নিখুঁতভাবে বিচার করে সবাইকে পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন, এ কথাটা তিনি আল-কুরআনের মাধ্যমে এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه .

অর্থঃ যে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদের কৃতকর্ম তাদের দেখানো হয় অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলেও তা দেখতে পাবে। (যিলযাল:৬-৮)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে শেষ বিচারের দিনে কিসের ভিত্তিতে অর্থাৎ কী প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে মানুষকে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে, তা বর্ণনা করেছেন।

যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় তা হচ্ছে, আয়াত ক'টিতে 'দেখা' বা 'দেখানো' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। 'পড়া' বা 'পড়ানো' শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ সেদিন আমলনামা 'দেখানো' হবে। এখান থেকে সহজেই বুঝা যায়, শেষ বিচারের দিন জীবনের সব কর্মকাণ্ড মানুষের সামনে উপস্থাপনের প্রধানতম পদ্ধতিটি হবে ভিডিও রেকর্ডিং দেখানো। কারণ–

১. যারা লেখাপড়া জানে না তারাতো পড়তে পারবে না এবং কারো লিখে রাখা বিষয়টা আসলে সত্য কিনা, সে ব্যাপারে মনে সন্দেহ হতে পারে।
২. ভিডিও রেকর্ডিং দেখতে পেলে কারো মনে, সে ঐ কাজটি করেছিলো কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকবে না।

আল্লাহ এখানে আরো বলেছেন, মানুষের অণু পরিমাণ কাজও রেকর্ড করে রাখা হবে। এখান থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর ভিডিও ক্যামেরা এত শক্তিশালী যে তা দ্বারা ঘরের বা বাইরের, রাতের বা দিনের, বড় বা ছোট সব কর্মকাণ্ডই রেকর্ড করা যায় এবং তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারীরা (ফেরেশতাগণ) সর্বক্ষণ তা করছেন

ঙ. আণবিক শক্তি (Atomic energy) ও হিমোগ্লোবিন (Hamoglobin)

আণবিক শক্তি (Atomic Energy) প্রথম আবিস্কৃত হয় ১৯৩০ সালে প্রথম আণবিক পরীক্ষা করা হয় ১৬ জুলাই ১৯৪৫ সালে এবং যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে প্রথম আণবিক বোমা ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে। চলুন এখন দেখা যাক, আল-কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এই আণবিক শক্তি ও আণবিক যুদ্ধের কথা কিভাবে ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...

অর্থ : এবং আমি লোহা বা ধাতু (Metal) অবতীর্ণ করেছি এতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্যে অনেক কল্যাণ... (হাদিদ:২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন, লোহা বা ধাতুতে (Metal) রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। লক্ষণীয় হচ্ছে মহান আল্লাহ ধাতুর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে, এ কথা জানিয়েছেন কিন্তু সেই প্রচণ্ড শক্তির মাত্রাটা (Limit) কী তা বলেননি। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে ধাতুর মধ্যে নিহিত শক্তির মাত্রার বিষয়টি উন্মুক্ত (Open) রেখেছেন। মানব সভ্যতায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ধাতুর মধ্যে এই শক্তির মাত্রার যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে– তরবারির শক্তি > গাদা বন্দুকের শক্তি > রাইফেলের শক্তি > কামানের শক্তি > মিসাইলের শক্তি > এটম বোমার শক্তি > হাইড্রোজেন বোমের শক্তি>?। তাহলে সহজে বুঝা যায়, মহান আল্লাহ ধাতুর মধ্যে নিহিত শক্তির ব্যাপারে যে শব্দটা আল-কুরআনে ব্যবহার করেছেন, তাতে মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আণবিক শক্তির ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে।

আয়াতে কারীমার উল্লিখিত অংশের শেষে আল্লাহ বলেছেন লোহার মধ্যে রয়েছে অনেক কল্যাণ। লোহার কল্যাণ বলতে সাধারণভাবে বুঝা যায় লোহা দিয়ে তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, দা-খুন্তি, বিভিন্ন বাহন, অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিস। কিন্তু লোহার প্রধান কল্যাণটি উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে ডাক্তারী বিদ্যায় রক্তের হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) আবিষ্কারের পর। লোহিত কণিকা (Red Blood Cell) মানুষের শরীরে অক্সিজেন (O_2) বহন করে। যে অক্সিজেন না হলে মানুষ ৪-৫ মিনিটের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না লোহিত কণিকার মধ্যে থাকা হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ধরে রাখার কাজটি করে এই হিমোগ্লোবিনের প্রধান উপাদান হল লোহা (Iron)

চ. ক্লোনিং (Cloning)

মাত্র দু'বছর আগে জীবের একটি কোষ থেকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে আর একটি জীব তৈরি করার কৌশল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। ১৯৯৮ সালে ভেড়ার একটি কোষকে ক্লোনিং করে 'ডলি' নামের একই চেহারা, লিঙ্গ এবং বয়সের আর একটি ভেড়া তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় মানুষটিকে (বিবি হওয়া) আদম (আ.)-এর একটি কোষ থেকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল, এরকম ইঙ্গিতই আল্লাহ দিয়েছেন সূরা নিসার প্রথম আয়াতে। আয়াতটি হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً.

অর্থ: হে মানব জাতি, ভয় কর তোমাদের রবকে যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি সত্তা (আদম আ.) থেকে। আর ঐ সত্তা থেকে তার জোড়া তৈরি করেছেন এবং ঐ উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী তৈরি করেছেন।

ব্যাখ্যা: লক্ষ্য করুন আল্লাহ প্রথমে বলেছেন, মানব জাতিকে একটি সত্তা থেকে তৈরি করেছেন। আমরা জানি সেই সত্তা অর্থাৎ প্রথম মানুষটি হচ্ছেন আদম (আ.) এরপর আল্লাহ বলেছেন, ঐ সত্তা থেকে অর্থাৎ আদম (আ.) থেকে তাঁর জোড় অর্থাৎ বিবি হাওয়াকে বানিয়েছেন। তারপর বলা হয়েছে, ঐ উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ এবং নারী তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ বলেছেন, আদম (আ.) থেকে তাঁর জোড় বানিয়েছেন। তারপর বলছেন, ঐ উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী বানিয়েছেন। এখান থেকে বুঝা যায়, বিবি হাওয়াকে মনে হয় আদম (আ.)-এর কোষ থেকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বানানো হয়েছিল। এরপর অসংখ্য পুরুষ ও নারী জন্ম হয়েছে তাঁদের যৌন মিলনের মাধ্যমে। মানুষের বর্তমান জ্ঞানে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে শুধু একই চেহারার এবং একই লিঙ্গের জীব বানানো যায় এবং তার বয়সও হয় যার থেকে কোষটি নেয়া হয়েছে তার বয়সের সমান। কিন্তু আল্লাহর ক্লোনিংয়ের পদ্ধতিতে ভিন্ন চেহারা, অন্য লিঙ্গ ও বয়সের জীব বানানো সম্ভব হওয়াতো কোন ব্যাপারই না।

❑ যেগুলো এখনও সত্যে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় আছে, তার একটা

❖ অন্য গ্রহে প্রাণীর উপস্থিতি

পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে প্রাণ আছে কিনা এ বিষয়ে বিজ্ঞান গবেষণা চলছে। এখনও পর্যন্ত অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি কুরআনের সূরা শূরার ২৯ নং আয়াত বলছে-

وَ مِنْ آيٰتِه خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ مَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط

অর্থ: তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে পৃথিবী ও মহাকাশের সৃষ্টি এবং জীবসমূহ যা তিনি উভয় স্থানেই ছড়িয়ে রেখেছেন।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলেছেন, তিনি পৃথিবী ও মহাকাশ এই উভয় স্থানেই জীব ছড়িয়ে রেখেছেন এখান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহেও জীব আছে। তাই আমার মনে হয়, গবেষণা চালু রাখলে একদিন অন্য গ্রহেও জীব আবিস্কৃত হবে

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ থাকার কারণ

প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা পৃথিবীর অন্য সব জাতির চেয়ে বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিল। কারণ, তাদের সবাই বা অধিকাংশই জানতো, মহান আল্লাহ কুরআনকে বুঝে বুঝে পড়তে বলেছেন এবং তাঁর বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন বা তা না করার জন্যে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেছেন। ফলে–

১. তাদের সবাই বা অধিকাংশই জানতো, কুরআন বিজ্ঞানকে কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে এবং কেন তা দিয়েছে,

২. তাই তারা হয় নিজে বিজ্ঞান গবেষণা করত, আর না হয় বিজ্ঞান-গবেষণাকে সব দিক থেকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতা দিত।

এর ফলস্বরূপ ঐ সময় মুসলমানরা বিজ্ঞানের সব দিকে অন্য সব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের বিজ্ঞানে চরম অধঃপতনের কারণ

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের বিজ্ঞানে চরম অধঃপতনের প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের–

- ❑ অনেকেই কুরআন পড়তেই পারে না,
- ❑ যারা পড়তে পারে তাদের অধিকাংশেরই তা পড়া শুদ্ধ হয় না,
- ❑ যাদের পড়া শুদ্ধ হয় তাদের বেশির ভাগই কুরআন অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়ে,
- ❑ যারা বুঝে পড়ে তাদের অধিকাংশই কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,

আর এর ফলস্বরূপ–

- ❑ বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান জানেই না, আল-কুরআন বিজ্ঞানকে কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে এবং কেন তা দিয়েছে,

- ❑ তাই তাদের অধিকাংশই নিজে যেমন বিজ্ঞান গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয় না, অপরকে তেমনই সে কাজে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয় না,
- ❑ সবচেয়ে মারাত্মক ফল হচ্ছে কওমী মাদ্রাসায় 'বিজ্ঞান' পাঠ্য তালিকায়ও না থাকা।

মুসলমানদের পৃথিবীতে আবার বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে প্রথম স্তরে যা করতে হবে

বিজ্ঞানে আবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে, প্রচলিত যে সকল তথ্য কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে, সেগুলোকে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রথমে উৎখাত করতে হবে। একটি গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের পথে যতগুলো স্তর আছে, কুরআনের জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে ঐ প্রতিটি স্তরে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতামূলক কথা মুসলমান সমাজে কিভাবে, ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু হতে ও থাকতে পারল, এটা আমার কাছে একটি বিরাট বিস্ময়ের ব্যাপার। স্তর অনুযায়ী কথাগুলো হলো–

ক. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে আকৃষ্ট হওয়ার স্তর

এ স্তরে এমন কিছু কথা চালু আছে যা মানুষকে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে আকৃষ্ট করার পরিবর্তে নিরুৎসাহিত করে। যেমন–

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বা সওয়াব নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি আমলের পরে,
২. কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকার গুনাহ শিরক, মিথ্যা বলা, জেহাদ না করা ইত্যাদির চেয়ে কম,
৩. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্যে ফরজ নয়,
৪. কুরআন বুঝা কঠিন,
৫. জ্ঞান অর্জনের চেয়ে আমলের গুরুত্ব বেশি।
৬. জানার পর না মানা, না জানার কারণে না মানার চেয়ে বড় গুনাহ।

❑❑ ব্যাপকভাবে চালু থাকা এ কথাগুলো, কুরআনের জ্ঞান অর্জনে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে মানুষকে কুরআনের জ্ঞানী হতে দিচ্ছে না। বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, মু'মিনের ১ নং কাজ ও শয়তানের ১ নং কাজ' নামক বইটিতে

খ. কুরআন ধরে পড়ার স্তর

একটি গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেটিকে ধরে তথা স্পর্শ করে পড়া লাগে যারা হাফিজ নয় তাদের কুরআন পড়তে হলে কুরআনকে ধরেই পড়তে হবে। কুরআন পড়ার ব্যাপারে এমন একটি কথা মুসলমান সমাজে চালু আছে যা কুরআন শরীফকে ধরে পড়তে পারার পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। কথাটি হল ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা (ধরা) নিষেধ বা গুনাহ।

একজন মানুষের জাগ্রত জীবনের বেশির ভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই এ কথাটি মুসলমানদের কুরআন পাঠের সময় ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। ফল স্বরূপ কুরআনের জ্ঞানী লোকও কম হচ্ছে। কথাটি চালু না থাকলে প্রত্যেক মানুষ পকেটে, ব্রিফকেসে, ভ্যানিটি ব্যাগে কুরআন রাখতে পারত এবং ঘরে, পথে, অফিসে মসজিদে যেখানেই সময় পেত কুরআন পড়ার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানী হতে পারত।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি হবে না' নামক পুস্তিকাটিতে।

গ. অর্থসহ বা বুঝে পড়ার স্তর

একটি গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেটি অবশ্যই অর্থসহ বা বুঝে পড়তে হবে। তাই কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হলেও কুরআনকে বুঝে পড়তে হবে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমান কুরআন অর্থছাড়া পড়ছে বা তেলাওয়াত করছে। ফলে তারা কুরআন পড়েও কুরআনের জ্ঞানী হতে পারছে না। যে কথাটি মুসলমানদের এই কর্মকাণ্ডটিতে উৎসাহিত করছে তা হল, 'অর্থছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী।'

অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লে গুনাহ হবে, না সওয়াব হবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব' নামক বইটিতে।

মুসলমানদের আবার বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে দ্বিতীয় স্তরে যা করতে হবে

কুরআনের জ্ঞানী হওয়ার পর তথা কুরআন বিজ্ঞানকে যে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে এবং কেন তা দিয়েছে তা জানার পর বিজ্ঞানে আবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে প্রতিটি মুসলমানকে যা করতে হবে তা হলো—

- ❑ নিজে বিজ্ঞান গবেষণা করতে হবে অথবা
- ❑ অন্যকে বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহিত করতে হবে এবং বিজ্ঞান গবেষণায় সব ধরনের সহযোগিতা করতে হবে

শেষ কথা

ছোট এ পুস্তিকাটি পড়লে আশা করি, ইসলাম বিজ্ঞানকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে এবং কেন তা দিয়েছে, কেন এক সময়ের উন্নত মুসলিম জাতি বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়েছে এবং বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হতে হলে মুসলমানদের আবার কী করতে হবে, এ সকল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও পাঠকের একটি পরিষ্কার ধারণা হবে।

মানুষ হিসেবে আমার ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। তাই প্রত্যেক পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব হবে ভুল ধরা পড়লে আমাকে জানানো। আর আমার ঈমানী দায়িত্ব হবে সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে সে ভুল শুধরিয়ে সঠিক তথ্যটি উল্লেখ করা। আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করেন, আপনাদের নিকট এ দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

❑ **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –**

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল (আ.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোন্‌গুলো তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি হবে না
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি–
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?

লেখকের নিম্নোক্ত বই বের হওয়ার অপেক্ষায়

- ❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –
  ১. ভোট না দেয়া বা ভুল স্থানে দেয়া কত বড় গুনাহ

প্রাপ্তিস্থান

- ❑ আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১ শাখা
  অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ফোন: ৯৩৩৯৪৪২
- ❑ ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭
- ❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
  রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- ❑ আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- ❑ তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭১২-০৪৩৫৪০
- ❑ ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন : ৮৬২৫০৯৭
- ❑ মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- ❑ এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে